মূর্ত-বিমূর্ত সংবাদ

অমিতাভ সেনগুপ্ত

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে আজকের প্রসঙ্গ শিল্পের কোনো বিশেষ ধারার বিষয় নয়, অথবা আমার নিজের ছবির কথাও নয়। কারণ বিমূর্ততার চিন্তায় আমি শিল্প-ইতিহাসের দিকে যেতে চাই না। এই নিয়ে বিস্তর বইপত্র, আলোচনা আছে। আবার শিল্পী হিসাবে নিজের কাজের অভিজ্ঞতাকে বিমূর্ততা দিয়ে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী আমি নই। আপাতত ইতিহাস বা 'আমি'র কথা থাক।

আজকের প্রস্তাব কিছুটা শিল্পের দর্শন ঘেঁষা। চেষ্টা করা মূর্ত-বিমূর্ত ধারণা থেকে শিল্পের ইমেজে আসা, এই বিবর্তনটাকে বোঝা যায় কিনা। শিল্পের মূল-সূত্রকে চিনতে গেলে ভিন্নতাকে না দেখে অভিন্নতাকে দেখাও যে আরেকটা প্রয়োজন, প্রসঙ্গ সেইদিকে। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়, ভিন্নতা ছাড়া অভিন্নতা আসে কী করে? ভালো ছাড়া মন্দ? দিন ছাড়া রাত বা মূর্ত ছাড়া বিমূর্ত? এইভাবেই আলোচনা এগোতে পারে— মূর্ত থেকে বিমূর্ত, ইতিমধ্যে শিল্পের ইমেজ।

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে কয়েকটি শব্দের মর্মার্থ ঠিক করে নেওয়া যাক। যেমন

শিল্পী, যার শিল্প-প্রসঙ্গ নিয়ে কথা। শিল্পী এখানে প্রধানত আর পাঁচজনের মতন 'মানুষ'। যার আছে একটি বহির্জগত এবং অন্তর্জগত। যেমন— একটা বস্তুর সীমিত রেখার বাইরের অংশ আউটার স্পেস, ভিতরের অংশ ইনার স্পেস, শিল্পীরও তাই। বাইরে ও ভিতর এই দুইয়ের সাধারণ সীমায় যে রেখা, সেটা তুলে দিলেই ভিতর-বাহির এক। কিন্তু সেই অবস্থায় বস্তুকে পাওয়া যায় না বা শিল্পী বলে বিশেষ ব্যক্তি নেই। অর্থাৎ ভিন্নতা একটা রেখা বা ব্যক্তিত্ব। এই রেখার দুইদিক থেকে যে ডায়ালগ তা থেকে আসে শিল্প বা মানুষের যে কোনো আচরণ।

মূর্ত

মূর্ত যা বাস্তব, আমাদের বহির্জগত। এই বহির্জগতের অনেকটাই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে। যেমন— বাতাস দেখতে পাই না— কিন্তু গায়ে লাগে।
এর গতির পরিমাপ করা যায়। রঙ দেখি গাছে, ফুলে, নানা বস্তুতে। আবার দেখি নিসর্গের যা কিছু সামনে তা পাল্টাতে থাকে দিগন্তের দিকে।
বস্তুজগতকে দেখা ও চেনার অভিজ্ঞতা মানুষের চিন্তাকে ক্রমে যেন প্রসারিত করে চলেছে। প্রকৃতির নানা ঘটনার কার্যকারণ, বস্তুর জৈব-অজৈব রূপ ইত্যাদির ধারণা এল সভ্যতা ও জ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এরই সঙ্গে এল মূল্যবোধ, উপলব্ধি ও প্রকাশের বিবর্তন। মূর্তজগতকে পরিপূর্ণভাবে চেনার চেষ্টা অনেকটা মানুষের নিজেকে চেনার চেষ্টা। এই ইচ্ছা বোধহয় মানুষের প্রকৃতিগত, কারণ এই বিবর্তনের গতি চলমান ও সক্রিয়।
শিল্পী কীভাবে মূর্তকে পায়? প্রথমত এই পাওয়াটা ঘটে চেতনায় এবং সংবাদটা আসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি দিয়ে। হয়তো এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় প্রয়োগে। দুজন শিল্পীর মধ্যে একই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার শারীরিক-মানসিক প্রক্রিয়াটা একই কিন্তু ভিন্নতা ঘটে উপলব্ধিতে। সুতরাং ব্যক্তিভেদে শিল্পের প্রকাশে বা দেখায় যে ভিন্নতা তা সত্য।
অর্থাৎ ব্যক্তির বাইরে বস্তুর এক প্রাকৃতিক সত্তা আছে যা স্বাধীনভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। সেই পরিপূর্ণ সত্যকে শিল্প খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ করে চলেছে। এই প্রসঙ্গটা আর একটু ভাবা যাক।
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়মে বস্তুকে দেখার ঘটনাটা নানা সীমিত অবস্থার অধীন। যেমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে যা দেখি তা ত্রিমাত্রিক বস্তুর সব নয়। অথবা ওই বস্তু সম্পর্কে আমার নানা ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে ইত্যাদি। এছাড়া ওই বস্তুর আপাত চেহারাটাও সব নয়, তার নানা সাব-স্ট্রাকচার আছে যার অস্তিত্ব আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে পাবার কথা নয়।
দেখার এই আপাত সীমিত অবস্থাকে হয়তো আরো উন্নত করা সম্ভব। যদি বিজ্ঞানের নানা আধুনিক ধারণাকে মেনে নেওয়া যায়, যেমন সব বস্তুর সাব-স্ট্রাকচারকে ভাঙতে

ভাঙতে কয়েকটা মূল উপাদানে পৌঁছাই— তারপরেও আছে একটা বস্তুহীন এনার্জিতে মিলিয়ে যাওয়া। বস্তুজগতের আদি সূত্রপাতও, ধারণা করা হচ্ছে, এনার্জির একটা প্রচন্ড আলোড়ন থেকে। সেই আদি উপাদানের নানা মিলিত ঘটনার ফল আবার বস্তুজগতের বিবর্তন— তার মধ্যে মানুষও আছে। অর্থাৎ বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপ অসীম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

তাহলে বস্তুর শুরুতে এবং শেষে যে অসীমতা, মাঝখানে থাকে রূপের বিবর্তন। দর্শনের ধারণাও অনেকটা একইভাবে বলা, এক থেকে বহু হওয়া। অথবা এক আদিসত্তার বহু প্রকাশ ইত্যাদি।

যদি বিজ্ঞান ও দর্শনের এই ধারণাকে পূর্ণ সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়, অন্তত বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে, তাহলেও শিল্পীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষমতার সীমিত অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে না। মানুষ হিসাবে শিল্পী প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গ, সাব-স্ট্রাকচারের অধীন এবং উপাদানগতভাবে সে নিজে গাছপালা-জল-পাহাড়ের সঙ্গে একটা বিবর্তনের সুরে বাঁধা। এই কসমিক ও অ্যাকসমিক ধারণা এক জ্ঞানলব্ধ চিন্তা, যার কিছুটা ছাপ হয়তো পড়ে শিল্পীর মনে। কারণ, শিল্পীও সচেতন সামাজিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে।

সুতরাং পূর্ণ সত্য বা অ্যাবসোলুট ট্রুথ বলে যদি কিছু থাকে তা অনুভূতি ও ধারণার মধ্যে। এই অবস্থায় দর্শন ও বিজ্ঞান যদি সত্য হয় তাহলে প্রাকৃতিক সত্য এবং ধারণার সত্য একই স্তরে এসে পৌঁছাতে পারে মানুষের সুপারকনশাস স্তরে।

তাহলে, মূর্তজগতকে শিল্পী বোঝে দুই ভাবে— প্রথমত দেহের সীমিত অভিজ্ঞতায়, দ্বিতীয়ত— যা আরো পরিব্যাপ্ত তা হল মনের উপলব্ধিতে, জ্ঞানে, বা বোধে। এর মিলিত সম্ভাবনা অসীম।

তবুও মূর্তকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় কি শিল্পীর প্রকাশে? লক্ষ করার, শিল্পীর মাধ্যমের বস্তুগত, আঙ্গিকগত এবং ইমেজের চরিত্র। রঙ, ক্যানভাসের ছবি বস্তুজগতের আপাত দৃশ্য অথবা ইঙ্গিতময় ইমেজ বহন করে। কোনোটাই একেবারে পরিপূর্ণ সত্য নয়। ছবিও হয় একটি আলাদা বস্তু, প্রাকৃতিক বস্তুরও প্রচ্ছায়া হয়ে। শিল্পী নিজে কোনো একটি বিশেষ অনুভূতিকে অবলম্বন করে ছবি শুরু করেন, কিন্তু মনে মনে চিন্তার বিবর্তনে বা রঙ-তুলির আবর্তনে অনেক আকস্মিকতার সম্মুখীন হন। অনেকটা ভেসে চলার মতন, কাজ গতি নেয় আকস্মিকতার স্রোতে। অবশেষে ফর্ম এবং কনটেন্টের একটা আভাস দেখা দেয়। শিল্পী শেষ করেন কাজ এক নান্দনিক পরিণতিতে। এই অবস্থার নানা ব্যতিক্রমও আছে, পূর্বপরিকল্পিত যেমন রিলিজিয়াস ও ইকনগ্রাফিক কাজে। সেখানে নিয়মভঙ্গ নেই। কিন্তু আকস্মিকতার ব্যবহার, অবচেতনকে মুক্তিতে আনা, আধুনিক অনেক ধারায় লক্ষ করা যায়।

কিন্তু তবুও শিল্পের কোনো ধারাতেই, গুহাচিত্র থেকে আধুনিককাল, স্থান-কাল-

সংস্কৃতিভেদে শিল্পের কোনো প্রকাশেরই বাস্তবের পূর্ণতা নেই। সবক্ষেত্রেই শিল্পের বিভিন্ন এক 'আইডিয়াল'কে মানা হয়েছে। শিল্প সেই চূড়ায় পৌঁছাতে চেয়েছে। কিন্তু এক এক আইডিয়াল এক একটা মাপকাঠি যা দিয়ে অসীমকে মেপে যাওয়া যায় অনন্তকাল ধরে। শিল্প তাই বিবর্তিত হয়ে চলেছে খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে আপন নিয়মে।

তাহলে মূর্ত যা আমাদের চিরপরিচিত এবং ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে, আসলে তা আছে এক অসীম পরিস্থিতির মধ্যে।

বিমূর্ত

বাস্তবতার পূর্ণতায় যদি শিল্প কোনো সময়ই পৌঁছাতে না পারে, তাহলে পূর্ণতার খোঁজ কেন? মানুষ ও প্রকৃতি, এই সম্পর্কের পরিপূর্ণ অর্থকে মানুষ জানতে চায়— আগেই বলেছি। এখন প্রশ্ন আসে, শিল্প যদি মূর্ত বা বাস্তবের প্রচ্ছায়া হয়, ইঙ্গিতবহ হয়, তাহলে শিল্প কি মূলত বিমূর্ত?

তাহলে তো বিমূর্ততা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে, শিল্পে প্রকাশ্য? তাই কি?

এ প্রসঙ্গে মূর্তকে আর একটু দেখা যাক। যেমন বস্তুর নানারূপ, এই বিশেষ রূপ ও নাম দিয়ে তৈরি হয় মানুষের পরিচিত জগত। এভাবে ভাবা যায় গাছ, পাথর, মানুষ··· ইত্যাদি অসংখ্য বস্তু থেকে সাধারণভাবে যে ধারণা তা হল বস্তু ও তার বিশেষত্ব অর্থাৎ রূপ। কিন্তু বস্তু বা রূপ এই দুই শব্দই বিমূর্ত ধারণা। রূপ বা ফর্ম বলতে অসীম সংখ্যক অবস্থা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আবার রূপ এই বিমূর্ত ধারণাকে পাই— আমগাছ, ফুল বা পরিচিত কোনো বস্তুকে ভেবে বা দেখে। এসবই রূপ— এই ধারণার সীমিত অর্থ বা প্রকাশ।

ভাবা যাক রঙ আরেক বিমূর্ত ধারণা। আবার লাল নীল বা হলুদও বিমূর্ত ধারণা, যতক্ষণ না বিশেষ রূপের মধ্যে তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা হচ্ছে। এই রঙ বলতে কোনো আলাদা বাস্তব অস্তিত্ব নেই, আমাদের চিন্তায় ছাড়া। কিন্তু বাস্তব করা হয় বস্তুর রঙ-এ, ক্যানভাসে হলুদ দিয়ে।

সময় বলতে কীভাবে বুঝি? সময় এক অসীম বা বিমূর্ত ধারণা মাত্র। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সময়কে দরকার, তাই পাওয়া ঘড়ির কাঁটায়, মৃত্যুর সীমায়, বা আনন্দ-বেদনার মুহূর্তে গুনে গুনে। তবুও সময় চলতে থাকে। বিমূর্তের এই ধারণা থেকেই মূর্তকে বোঝা।

তাহলে মানুষ মূর্তের মধ্য দিয়ে বা রূপ থেকে রূপের বিমূর্তে পৌঁছায়। অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধিতে, তারপর জ্ঞান, মূল্যবোধ, বিচার ও আচরণ অর্থাৎ শিল্পের প্রকাশ। অন্তর ও বহির্জগতের এই আদান-প্রদান সক্রিয় ও চলমান।

বিমূর্তকে প্রকাশে পেতে গেলে মূর্তে পৌঁছাতে হয়। আবার মূর্তকে দেখারও যেন শেষ নেই। শিল্পের কোনো এক ফ্রেমে মূর্ত তার পূর্ণতায় প্রকাশিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে শিল্পী যা খোঁজে তা মূর্তের আরো ব্যাপ্ত, আরো পূর্ণতর অর্থাৎ— বিমূর্তের ইঙ্গিতবহ কোনো ইমেজ। শুরু হয় ইমেজের সন্ধান নানাভাবে।

[বক্তব্যের এই পর্যায়ে এসে চৌদ্দটি কালার স্লাইড দেখানো হয়। রেনোয়াঁস (মাইকেল এনজেলো) আধুনিক পাশ্চাত্য অ্যাবস্ট্রাকট (ভিকটর ভাসারেল্লী), নাইজেরিয়ার ট্রাইবাল আর্ট ফর্ম (নক, ইফে, ইবো ইত্যাদি), একটি বাগানের লাল ক্যাকটাস ফুল এবং কিছু ভারতীয় সমকালীন কাজ (প্রবীর গুপ্তের 'মুখ', সোমনাথ হোরের 'ক্ষত' সিরিজের কিছু ব্রোঞ্জ এবং অমিতাভ সেনগুপ্তর দুটি কাজ)। উদ্দেশ্য, খুব সংক্ষেপে শ্রোতাদের মনে ধরিয়ে দেওয়া সময়-সমাজ-সংস্কৃতিভেদে শিল্পের ইমেজের বিবর্তন এবং সব ইমেজই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু বিমূর্তের ইঙ্গিতবহ, ইত্যাদি।]

ইমেজ

আউটার স্পেস ও ইনার স্পেস যেখানে মিলিত ইচ্ছে সেই সীমারেখা দিয়ে ইমেজ পায় রূপ। সেই রেখার গতিকে, দিককে পাল্টালেই রূপ বিবর্তিত হয়। এই গতিকে সরলীকৃত অবস্থায় আনা যায়, রূপ হয় এক সরল মূল আকৃতি যেমন গোল, চতুষ্কোণ, সরল বা বক্ররেখা ইত্যাদি।

কিন্তু, এই ইমেজকে এভাবে পাল্টানোর চিন্তা কেন? কারণ বস্তুর আপাত দৃশ্য থেকে গভীরে যাওয়ার চেষ্টা। এটা কীভাবে নানা শিল্পরীতি নানাভাবে চেষ্টা করে তার আভাস পাওয়া গেল স্লাইডগুলিতে। এই গভীরতায় পৌঁছানোর চেষ্টাতেও দেখা যাচ্ছে যুগচিন্তার উপলব্ধি। সব যুগেই উপলব্ধির এক 'আইডিয়াল'কে খাড়া করা হয়েছে, আর সেই যুগশিল্পী তার ইমেজ দিয়ে পৌঁছাতে চেয়েছে সেই আইডিয়ালে। 'আইডিয়াল' যা তা চিন্তার, অসীম বা পূর্ণতা সম্পর্কে ধারণার, অর্থাৎ শিল্পের ভাবসত্য। ভারতীয় জীবনধারাতেও এই আইডিয়ালের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় বস্তুজগতকে স্বীকার করা হলেও প্রধান খোঁজ যেন অসীমের। অন্তর্জগত ও বহির্জগতকে নানাভাবে বলা— পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও ব্রহ্ম, দ্বৈত ও অ-দ্বৈত, ইত্যাদি। এসব বিশ্লেষণের মধ্যে ব্রহ্মকেই যেন বেশি ভাবা হয়েছে। জৈন বা বৌদ্ধ চিন্তায়ও যেন ভাবা হয়েছে জীবনের পূর্ণতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, উদ্দেশ্য চেতনার বিকাশে। পূর্ণ জ্ঞান বা মোক্ষ যা হল জীবন থেকে মুক্তি।

যেহেতু ভারতীয় উপলব্ধিতে মূর্ত গৌণ, বিমূর্তই পূর্ণতা, ইমেজ এখানে এক সরলীকৃত ধারণা। এমনকি ইমেজ ইঙ্গিতবহ হয়ে সরলীকরণের এক চরম পর্যায়ে এসেছে। যেমন বিন্দু, স্বস্তিক চিহ্ন, ইত্যাদি। রিয়ালিজমের যে লক্ষণগুলি— ত্রিমাত্রিকতা, আলোছায়া, পারস্পেকটিভ, ইত্যাদি— তার বিশেষ চর্চা ভারতীয় ধারায় বহুদিন ধরে দেখা যায়নি। রঙ-এরও যে সংক্ষিপ্ততা তাও একই চিন্তার ইঙ্গিত। অর্থাৎ আইডিয়াল এখানে অনন্ত সুন্দরের ধ্যানে। ছবিতে গাছ, মেঘ, পাহাড়, জল, মানুষ সব যেন প্রাকৃতিক রহস্যের এক মূল ছন্দে বাঁধা।

মনে হয় এই মূল চিন্তাধারা পরবর্তী বেশ কিছুটা সময় ধরে ইসলামিক ও পাশ্চাত্য চিন্তার সঙ্গে মিশে গেলেও একটা স্রোতের মত বহমান। নানা প্রভিন্সিয়াল কোর্ট-আর্ট এবং কোম্পানী আর্ট, এর পরে পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক আর্ট-এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পের যে বিবর্তন তা মূলত সমাজ ও রীতিগত বিবর্তন। কারণ সমকালীন শিল্পে এসে নানা রীতির মিশ্রণ ঘটলেও আইডিয়ালের সেই মূল চিন্তা এখনও অবিচ্ছিন্ন।

সুতরাং শিল্পে বিবর্তন দুইভাবে, ভাবসত্যের যা চিন্তায় এবং ইমেজের যা প্রকাশে। শিল্পীর বাইরে বস্তু বা মূর্ত জগত আবার দাঁড়িয়ে আছে আর এক অনন্ত সত্য নিয়ে, স্বাধীন। এই দুই সমান্তরাল স্রোত, ভাবসত্য ও প্রাকৃতিক সত্যের মাঝখানে যে আদান-প্রদান, তার মধ্য দিয়ে শিল্প কোনো অ্যাবসোলুট স্টেট-এ পৌঁছাতে পারে কি? পূর্ণতা? সেখানে কোনো ইমেজ থাকে? সে অবস্থা যেহেতু প্রকৃত নয়, যা প্রকৃত তা হল ক্ষণিক বা খণ্ড অবস্থা। ইমেজ কখনোই মূর্তের পরিপূর্ণ রূপ নয়, বা পরিপূর্ণ বিমূর্তকরণ নয়— শুধু মূর্ত-বিমূর্তের বিবর্তন সংবাদ। □